সংস্কার সংলাপ

সূচনা সূত্র

রাষ্ট্র, নির্বাচন, শাসন-প্রশাসন ও সংবিধান

তোফায়েল আহমেদ

সংস্কার সংলাপ

সূচনা সূত্র

রাষ্ট্র, নির্বাচন, শাসন-প্রশাসন ও সংবিধান

তোফায়েল আহমেদ

প্র কা শ ন

উৎসর্গ

আমাদের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি
নাতনি সাজফা সরওয়ারের হাতে
বইটি তুলে দিলাম।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ □ ০৯

ভূমিকা □ ১৫

প্রথম গুচ্ছ □ ১৯-৫৪

বাংলাদেশে পূর্ণ গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র, নির্বাচন, শাসন-প্রশাসন ও সংবিধান বিষয়ে পাঁচটি সংস্কার প্রস্তাব

- সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ও স্থানীয় জাতীয় নির্বাচন □ ২৩
- বাংলাদেশে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন □ ৩১
- জাতীয় বিকেন্দ্রায়ন নীতি প্রণয়ন : শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রশাসন, বিচার, অর্থ মুদ্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস □ ৩৩
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার : সকল স্থানীয় নির্বাচন একটি একক তফশিলে করা সম্ভব □ ৪৩
- জাতীয় নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট এবং এন.আর.বি. ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চাই □ ৫০

দ্বিতীয় গুচ্ছ □ ৫৫-৮৯

স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসন

- স্থানীয় সরকার : প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ □ ৫৭
- স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাশন : দ্বৈত শাসন আর নয়, চাই একীভূত শাসন কাঠামো □ ৬৯
- তুলনামূলক স্থানীয় সরকার : ভারত ও বাংলাদেশ □ ৭২
- মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সংস্কার □ ৭৮
- নিখোঁজ জেলা পরিষদকে দৃশ্যমান করুন □ ৮০
- উপজেলা পরিষদ জটিলতার অবসান চাই □ ৮৩
- গ্রামে হবে সালিস, আদালত হোক উপজেলায় □ ৮৮

তৃতীয় ভাগ □ ৯১-১২৩

সরকারের জন্য কিছু নীতি সুপারিশ

- সরকারি ব্যয় সংকোচননীতি প্রসঙ্গে □ ৯৩
- আউট সোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আড়ালে শোষণ–বঞ্চনা □ ৯৬
- প্রশাসন ও রাজনীতির বরিশাল উপাখ্যান □ ৯৯
- দুর্নীতির দুষ্টচক্র থেকে বের হবার উপায় কী? □ ১০২
- প্রশাসনের উপরওয়ালাদের সুলুক সন্ধান □ ১০৫
- বহুদিন কোনো 'ডাক' পাই না : ডাক বিভাগের সংস্কার চাই □ ১০৮
- বাংলাদেশে নাগরিক পেনশন □ ১১৪
- বাংলাদেশে দান-অনুদান ও চাঁদা প্রথা : সংকুচিত জনপরিসর ও অবহেলিত প্রাতিষ্ঠানিকতা □ ১১৬

চতুর্থ গুচ্ছ □ ১২৫-১৫২

শিক্ষাঙ্গণের নানা সংস্কার ভাবনা

- কোভিড-১৯ : শিক্ষা ক্ষতি-পুনরুদ্ধার ভাবনা □ ১২৭
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও ফলাফল : কিছু প্রশ্ন □ ১৩৫
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ফলাফলের স্বচ্ছতা ও ভর্তির নীতিমালা □ ১৩৯
- ভর্তি নীতিমালায় কোটা প্রথা সংবিধান লঙ্ঘনের সামিল □ ১৪১
- উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে কেমন হয়! □ ১৪৩
- শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নয়, শিক্ষাই প্রাধান্য পাক □ ১৪৬
- বি-রাজনীতিকরণ ও অতি-রাজনীতিকরণের মাঝামাঝি থাকুক শিক্ষাঙ্গণ □ ১৪৯

পরিশিষ্ট □ ১৫৩-১৯১

১. List of Countries with diffrent types of parliament and electoral system with specially proportional representation (PR) system □ ১৫৪
২. Governmental structure in Bangladesh: Government Agencies under Ministries and Divisions □ ১৭০
৩. ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী করার জন্য ১২ দফা ও দেশের সামগ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ছয় দফা প্রস্তাবনা □ ১৮৭

মুখবন্ধ

বহু গ্রন্থের রচয়িতা শিক্ষাবিদ ও শাসন বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ তাঁর সুলিখিত *'সংস্কার সংলাপ'* গ্রন্থের মুখবন্ধ আমাকে লেখার দায়িত্ব দেওয়ায় আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। তাঁর নিজের ভাষায় বইটিতে 'চারটি বৃহত্তর বিভাজনে সংস্কার-এর বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম গুচ্ছে পাঁচটি বিষয় অবতরণা করা হয়েছে। প্রথম দুইটি বিষয় হচ্ছে বর্তমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন পদ্ধতি (Proportional Representation) চালু করা প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে — এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ ব্যবস্থার বদলে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাব।'

অন্য তিনটি বিষয় হচ্ছে — 'যথাক্রমে জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোকে রাষ্ট্রপতি সরকারের আদলের স্থলে সংসদীয় কাঠামোতে রূপান্তর করে একটি একক সিডিউলে সব স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা ও সর্বশেষে অনুপস্থিত, অক্ষম এবং প্রবাসী ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সহজ করার জন্য পোস্টাল ব্যালট সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।'

বইটিতে দ্বিতীয় গুচ্ছে মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক ৭টি প্রবন্ধ, তৃতীয় গুচ্ছে সরকারের নির্বাহী বিভাগের নানা নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে আটটি প্রবন্ধ এবং শেষ গুচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে।

সারাবিশ্বে যখন গণতন্ত্রের সংকট চলছে — বিগত পঞ্চাশ বৎসরেও নব্য স্বাধীন বাংলাদেশ যখন নির্বাচনের মতো জরুরি বিষয়েও কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করতে পারেনি, তেমনি একটি সময়ে এই বিরল বইটি জাতিকে নতুন দিক নির্দেশনা দিবে — এটাই প্রত্যাশা।

বইটির ভূমিকায় প্রথম বাক্যটি হচ্ছে 'রাষ্ট্র ও শাসন সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া।' বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের এ প্রক্রিয়াটির সূত্রপাত হয় — ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। ঐ দিন জাতি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুজিবনগরের আম্রকাননে ঘোষণা করে। ঐ ঘোষণায় নতুন রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলা হয়েছিল — 'In order to ensure for

the people of Bangladesh equality, human dignity, and social justice.' ঐ ঘোষণাপত্রটি আমাদের শাসনতন্ত্রে ৭ম তফসিলে স্থান পেয়েছে। এটাই 'জাতির কাছে জাতির চুক্তি'। যার প্রবক্তা ছিলেন, প্রাচীন গ্রিক. সফিস্টরা এবং পরবর্তীতে Thomas Hobbes, John Locke, এবং বিশেষভাবে Jean Jacques Rousseau প্রমূখ রাজনৈতিক দার্শনিকরা।

গ্রন্থকারের ভাষায়— 'চলমান নির্বাচন পদ্ধতি যা মেজরিটারিয়ান বা First Past The Post (FPTP) system নামে পরিচিত এবং এ পদ্ধতির নির্বাচনই আইন সম্মতভাবে বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতেই ১৯৭০-২০১৮ পর্যন্ত ১১টি সংসদীয় নির্বাচন, প্রায় ৮ বা ৯টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, এবং অসংখ্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে তা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। ...এর মধ্যে শুধু ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ের চারটি নির্বাচন ছিল একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ঐ চারটি নির্বাচন একটি ভিন্নতর ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভিন্ন একটি ব্যবস্থায় ঐ নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে সে ব্যবস্থা আর কার্যকর নেই। যদিও প্রবল জনদাবি আছে, কিন্তু কখন, কীভাবে হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। অপরদিকে নির্বাচনে সনাতনী ব্যবস্থাপনাগত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত সীমাবদ্ধতা যা ছিল তা এখন প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এখন নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন না করে শুধু ব্যবস্থাগত ত্রুটি সারিয়ে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্য অর্জন করা দুরূহ হবে। তাছাড়া বিদ্যমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্বের প্রায় ৮৭টি রাষ্ট্র সংস্কার করে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সমতাভিত্তিক, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ সব প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বর্তমানে অনুসৃত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নির্বাচন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশটি বিবেচনার আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, বর্তমান ব্যবস্থায় ১৯৯১ সালের ভালো নির্বাচনেও 'এ নির্বাচনে সরকার গঠনকারী দল বিএনপির প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩০.৮১ শতাংশ ও আসন সংখ্যা ছিল ১৪০ বা ৪৬ শতাংশ। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোট ছিল, ৩০.০৮ ও আসন প্রাপ্তি ছিল ৮৮ বা ২৯ শতাংশ। ...সার্বিকভাবে বিএনপি ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭০ শতাংশ ভোটারের বিপরীতে ১৯৯১ সনে শাসন অধিকার লাভ করে।'

একইভাবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে, 'এ নির্বাচনে ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ১৪৬ (৪৯%) টি আসন অধিকার করে সরকার গঠন করে।'

'২০০১ ও ২০০৮-এর নির্বাচনে সরকার গঠনকারী বিএনপি ৪০.৯৭ শতাংশ এবং ২০০৮ সনে আওয়ামী লীগ ৪৮.৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে।'

দেখা যাচ্ছে—বর্তমান পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সরকার গঠনে কোনো ভূমিকাই রাখতে পাচ্ছে না। সংখ্যালঘিষ্ঠরা সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন করছে। এটাকেই John Stuart Mill-এর (যার উদ্ধৃতি বইয়ে দেওয়া হয়েছে) ভাষায়—

> 'Contray to all just government, but, above all, contrary to the principle of democracy which professes equality as its very root and foundation.'

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় তাই 'Equality' কে রাষ্ট্রের 'Foundation' করা হয়েছে। একটি দেশের ৭০ বা ৬০ ভাগ মানুষকে দেশ শাসন থেকে বঞ্চিত করার চেয়ে আর বড় অবিচার কী হতে পারে। অথচ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণায় আমরা 'Social Justice' কে রাষ্ট্রের 'Foundation' বলেছি।

এমন একটি অবস্থাকে Howard Zinn তাঁর '*A People's History of the United States*' গ্রন্থে Crisis of Democracy বলতে গিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন—

> President Bill Clinton was reelected in 1996 with a distinct lack of voter enthusiasm. As was true in 1992 (when 19 percent of the voters showed their distaste for both parties by voting for a third-party candidate, Ross Pero), the electorate was clearly not happy about its choices. Half of the eligible voters stayed away from the polls, and of those who did vote, only 49 percent chose Clinton over his lackluster opponent, Robert Dole. One bumper sticker read: 'If God had intended us to vote, he would have given us candidates.'

'সংস্কার সংলাপ'-এর লেখক উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। Proportional Representation পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণার প্রতিফলন ঘটেছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের ৮৭টি দেশে এ পদ্ধতিটি কাজ করছে। এমনকি ১৯৭৭ সালের 'The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka' তে দেখতে পাচ্ছি—তারা এ পদ্ধতিটি তাদের সংবিধানে ৯৯ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছে। এ পদ্ধতির ইতিবাচক দিক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে Karl Loewenstein তাঁর বিখ্যাত '*Political Power and the Governmental Process*' গ্রন্থে লিখছেন—

> 'While the electorate was confined to the upper strata of a relatively homogeneous society, the straight majority technique worked tolerably well. With the advent of mass democracy, it revealed a glaring injustice: the winner takes all, the loser gets nothing. Minorities are discriminated against to the point of

> being disenfranchised. The remedy was sought in proportional representation, which, at long last, recognized the facts of political life, namely, that elections are operated by the political parties. By theoretical logic, proportional representation is beyond challenge: each party should obtain the number of seats equivalent to the number of votes cast for it in the entire nation.'

তবে এ পদ্ধতির অমঙ্গলের দিকটি তুলে ধরে বলেছেন যে, এর দ্বারা যত না রোগের নিরাময় হয়; তার চেয়ে নতুন রোগের সৃষ্টি হয় বেশি। আমাদের গ্রন্থকারও এ পদ্ধতিটির অপকারিতা সম্বন্ধে তার সাহসিক স্বীকৃতি দিতে ভুলেননি। বলা হয়—'মঙ্গল, অমঙ্গলের নিদান' অমঙ্গলকে তাড়িয়ে দিলে মঙ্গল সমেত উড়ে যাবে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করবে, বিশেষ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, তার ইতিহাস, সদিচ্ছা এবং প্রায়োগিক দক্ষতার উপর। আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটাকে অবশ্যই অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে।

লেখকের দ্বিতীয় প্রস্তাবনা অর্থাৎ এককক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের পরিবর্তে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাবও এখন প্রায় জাতীয় দাবি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ধারণা সুপ্রাচীন। ঐতিহাসিক Plutarch জানাচ্ছেন, আইনবেত্তা Solon এই Upper Chamber-এর জনক। Solon খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩০-৫৬০ সময়কালে এথেন্সবাসীর অনুরোধে তাঁর বিখ্যাত '*আইনকোষ*' উপহার দেন। ড্রাকনের দেওয়া আইনের মাধ্যমে নির্যাতিত হওয়ার পর তারা এ নতুন কোডের মাধ্যমে দেশে সুশাসন ফিরে পায়। Solon দ্বিতীয় Chamber-এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। Plutarch এর মতে—

> 'That the state with its two councils should ride, as it were, at double anchor and should therefore be less exposed to the buffeting of party politics and better able to secure tranquility for the people.'

Solon-এর প্রজ্ঞা, বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করেছে। আমেরিকার সিনেট এবং ভারতের রাজ্যসভা ইতিহাসে তাদের যোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আমাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রয়োজন। লেখকের প্রস্তাবটি জাতি গ্রহণ করবে এটাই প্রত্যাশা।

'পোস্টাল ব্যালট' সম্বন্ধে লেখকের ব্যাখ্যা সুচিন্তিত। আমাদের বৈদেশিক আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কষ্টসাধ্য অর্জন থেকে। তাছাড়াও সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ দল দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে কাজ করার কারণে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না। এ উভয় শ্রেণি ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে

বঞ্চিত। ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে, তাদের এ অধিকার প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা। পোস্টাল ব্যালট অবশ্যই সময়ের দাবি।

মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে লেখক নিজেই একজন গবেষক এবং প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং এ বিষয়ে তুলে ধরা ব্যাখ্যা সুলিখিত এবং দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল। জাতির কল্যাণে এ প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি।

বইটি সুলিখিত এবং প্রাঞ্জল। বইটির ব্যাপক প্রচার এবং প্রয়োগ কামনা করছি।

বিচারপতি এম এ মতিন

ভূমিকা

রাষ্ট্র ও শাসন সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে তার পিছনে কোনো না কোনো স্বার্থ গোষ্ঠীর চাপ, তাপ, সচেতন উদ্যোগ, প্রভাব-প্রণোদনা সর্বোপরি নাগরিক দাবি এবং রাজনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক দলসমূহের দৃঢ় ইচ্ছা থাকতে হয়। বাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিবর্তন, সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সরকারি নীতি পরিবর্তনের বিষয়গুলো দেখলে দেখা যায় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণির ভেতর থেকে একান্ত নিজেদের প্রয়োজনেই করা হয়। যেমন সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি কিংবা বহুদলীয় থেকে একদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর, পুনরায় বহুদলীয় ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন এসবে জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হলেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুব বেশি ছিল না। নব্বইয়ের দশকে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার প্রবল আন্দোলনে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর একটি কাঠামো সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়, তার পিছনে দীর্ঘ সংগ্রাম ছিল। পরপর তিনটি জাতীয় নির্বাচন এ ব্যবস্থাধীনে করার পর তা সংবিধানের আর এক সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। তবে প্রথম থেকে সংবিধানের সংশোধনীগুলোর পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সব সময় শাসক দল বা গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রয়োজন থেকে সংশোধনীগুলো করা হয়েছে। এখন আবার সে পূর্বাবস্থায় তথা তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনকালীন সরকারে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন চলছে। এসব পরিবর্তনের যে বৃত্তাকার পরিভ্রমণ বা একই বৃত্তে ঘুরপাক এটা যে শুধুই 'নির্বাচনকেন্দ্রিক' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু নির্বাচন ছাড়াও রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় অনেক কার্যকর পরিবর্তন প্রয়োজন; সুশাসনের জন্য নানা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। দীর্ঘ মেয়াদে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের নানা বিষয়গুলো সকল সময়ে অধরা, অনাবৃত ও অনালোচিত থেকেই যাচ্ছে। নির্বাচনের পর নব গঠিত সরকারগুলো পুরোনো কায়দার শাসন ব্যবস্থা সাজিয়ে নেন। এটিই যেন জাতির নিয়তি।

ভালোমন্দ নির্বাচন হয়। কখনও ক্ষমতার পালাবদল হয়। কখনও হয় না। কিন্তু সুশাসন, স্ব-শাসন এবং জনস্বার্থে রাজনীতি, শাসন ও সরকারে যে সব বিষয়ে উত্তরণ ও উন্নয়ন দরকার রাজনৈতিক শ্রেণির সে সব বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না । ২০০৫-

২০০৮, এ সময়ে 'সংস্কার' এর এক প্রবল ঝড় এসেছিল। সংস্কারের সঙ্গীতে আকাশ বাতাস মুখরিত ছিল কিছুদিন। ২০০৮-এর নির্বাচনের পর সে ঝড় থেমে বাতাস উল্টো দিকে বইতে শুরু হলো। 'সংস্কার' ও 'সংস্কারবাদী' একটা ঘৃণ্য রাজনৈতিক গালি হয়ে উঠল। ২০১১ সনে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে নতুন সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হয় তাতে সংবিধান ও রাষ্ট্র বিষয়ক সকল চিন্তা পুরোপুরি একটি ভিন্নতর সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

২০২১-২০২২ থেকে সংস্কারের নানা প্রসঙ্গ নানাভাবে পুনরায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাজনীতি মূলত এখনও নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিয়েই আবর্তিত। তবে বুদ্ধিজীবী বলতে যাদের বোঝায় তাদের একটি বড় অংশ শুধু অর্থনৈতিক ইস্যু যেমন — মুদ্রা, ব্যাংক, ট্যাক্স, অর্থপাচার, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি ইত্যাদির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়গুলো সামনে আনেন না বা আনতে সংকোচ বোধে আড়ষ্ট থাকেন। কখনও সংস্কার প্রসঙ্গ আসলেও তা আবারও নির্বাচনের চোরাগলিতেই ঢুকে পড়ে। তাই পুরোনো কিছু শাসনতান্ত্রিক প্রসঙ্গ এখানে নতুনভাবে অবতারণা করা হলো।

এখানে চার পৃথক গুচ্ছে চারটি বৃহত্তর বিভাজনে সংস্কারের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম গুচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম দুটি বিষয় হচ্ছে বর্তমান সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে আনুপাতিক বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন পদ্ধতি (Proportional Representation) চালু করা প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদের ব্যবস্থার বদলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় সংসদ প্রবর্তনের প্রস্তাব। এই দুটি বিষয়ে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য হলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে। পরের তিনটি বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে না, কিছু বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন এবং শাসন বিধি সংস্কার করলেই তা করা সম্ভব। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে জাতীয় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি, দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোকে রাষ্ট্রপতি সরকারের স্থলে সংসদীয় কাঠামোয় রূপান্তর করে একটি একক সিডিউলে সব স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা ও সর্বশেষে অনুপস্থিত, অক্ষম এং প্রবাসী ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সহজ করার জন্য 'পোস্টাল ব্যালট' সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয় গুচ্ছে মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ, তৃতীয় গুচ্ছে সরকারের নির্বাহী বিভাগের নানা নীতি ও কার্যক্রম নিয়ে আটটি প্রবন্ধ এবং শেষ গুচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক সাতটি রচনা স্থান পেয়েছে। ধরতে গেলে প্রতিটি রচনাই এক একটি স্বতন্ত্র মৌলিক চিন্তাকে আশ্রয় করে বিকশিত। প্রথম গুচ্ছের চারটি রচনার সাথে তিনটি দীর্ঘ পরিশিষ্ট যুক্ত করা হয়েছে। রাজনীতি বিজ্ঞান ও প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের পরিশিষ্টগুলো কাজে লাগতে পারে। সংস্কার যদিও বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় বিষয় নয়, তবুও আশা করি সংস্কার নিয়ে চিন্তা যারা করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন তারা কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন।